বাংলা ভাষা উন্নয়নে রামমোহনের ভূমিকা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

সারসংক্ষেপ: রামমোহন রায় ভারতের প্রথম আধুনিক মনীষা। সমাজ সংস্কার, বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা বন্ধসহ বহুবিধ সামাজিক কল্যাণকর কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, বহু ভাষাজ্ঞানে সমৃদ্ধ। স্বকীয় কর্তব্যবোধের বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করেছেন। বাংলা গদ্য রচনার পথিকৃৎ তিনি। রামমোহনই প্রথম বাঙালি যিনি নিজ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। এ-প্রবন্ধে, বাংলা ভাষা উন্নয়নে রামমোহনের ভূমিকা অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩) হিন্দুধর্মের মহান সংস্কারক হিসেবে সমধিক পরিচিত। পশ্চিম বাংলার রাধানগর গ্রামে এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীনে সুনামের সাথে চাকরি করতেন এবং নবাবের কাছ থেকে 'রায় রায়ান' উপাধি লাভ করেন। তখন থেকেই এই পরিবার 'রায়' পদবী ব্যবহার করতে থাকেন। রামমোহন মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরেজি এবং ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। রামমোহন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভালোভাবে আয়ত্তের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মাচার বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। কুসংস্কার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে রামমোহন বেড়ে উঠলেও তাঁর ভাবনা-চিন্তা ছিল আধুনিক ও মানবধর্মে উজ্জীবিত। দিল্লির পুতুল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ্ নিজের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য ইংল্যান্ডে গিয়ে তদ্বির করতে পারে, এমন একজন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করছিলেন। আকবর শাহ্ রামমোহনের বিষয়ে জানতেন। রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। এ কারণেই রামমোহনের নামের পূর্বে 'রাজা' উপাধি লক্ষ করা যায়।

রামমোহন ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সংস্কার ও পুঁথিশাসিত আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মানবতন্ত্রবাদকে (Humanism) উচ্চে স্থান

*অধ্যাপক (বাংলা) ও ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.1

দেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ ১৫ বছরের মধ্যে তিনি ৩০টি বাংলা বই রচনা করেন। বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজি ভাষায়ও অনেক লিখেছেন; আরবি এবং ফারসিতেও কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামমোহন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'সীরাতুল আখবার' নামে ফারসি ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। রামমোহনের রচনাসম্ভার, সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানাবিধ গবেষণাকর্ম ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সেসব গবেষণাকর্ম ও প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে, বাংলা ভাষা উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২

ভাষা মানুষ ব্যবহার করে এবং যোগাযোগের জন্য মানুষের প্রধান হাতিয়ার হলো ভাষা। সেজন্য একটি জাতির উত্থান, পতন, সাংস্কৃতিক ধারা সবকিছুই ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, মুসলমান শাসকরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইউরোপীয়দের তুলনায় বহুগুণে পিছিয়েছিলেন। ইংরেজদের কাছে পরাজিত মুসলমান শাসকশ্রেণি ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে দূরে অবস্থান করেন। একই সাথে রাজভাষা ফারসি ও ধর্মীয় ভাষা আরবির প্রতি দুর্বলতা থাকায় ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজদের এড়িয়ে চলার মনোভাব বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার দুয়ারকে সংকুচিত করে। রামমোহনের ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলায় নবজাগণের সূচনা হয়েছিল। বাংলায় ও বাংলার বাইরে মুসলমান সমাজেও ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে আলোড়ন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো সংযোগ ঘটায়নি; সে আন্দোলন তাকে নিয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীলতার সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে (আনিসুজ্জামান, ২০০১ : ৪৭)। তাছাড়া, হিন্দুপ্রধান ভারতে শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-ভারতীয়গণ ইংরেজদের কাছে অধিক বিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল। ইংরেজ শাসনকালে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হয়। মুসলমানদের হাতে পরিমিত নগদ অর্থ না থাকায় হিন্দুরা নতুন জমিদারি লাভ করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেও হিন্দুপ্রাধান্য ছিল; সেজন্য, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দ্বার খুলে যায় (আনিসুজ্জামান, ২০০১ : ১৮-১৯)। ফলে, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা এগিয়ে যায়।

রামমোহনের চিন্তার জগতে আধুনিকতা ও ইউরোপীদের বিজ্ঞানমনস্ক অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা থেকে উন্নততর মনে করে বিশ্ববিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন জীবনগঠনে সহায়ক হবে, এবং, ইংল্যান্ডের মতোই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হলে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন অনেকাংশে কমে যাবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধিকারবোধের এমন বিকাশ

ঘটাবে, যার ফলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে (দে, ১৯৯১ : ৭)। রামমোহন ইংরেজদের সহযোগিতায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকশিত করতে চেয়েছিলেন, এবং, সমাজের অনেক কুসংস্কার ও সমস্যা নিয়ে সবার আগে রামমোহন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সব চিন্তা তিনি কর্মে রূপায়িত করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর সেই চিন্তাপ্রসূত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বির্তক সেকালের নিস্তরঙ্গ সমাজের সচেতন জনস্তরে কিছুটা তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল (ঘোষ, ১৯৮৪ : ১১-১২)।

তৎকালীন হিন্দু নারীদের দুর্দশা রামমোহনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ ও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি তার ভাবনা-চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেছিল। ধর্মের অজুহাত দেখিয়ে নারীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ববাদের বিষয়টি রামমোহনের নজরে আসে। রামমোহন বিশ্বাস করতেন শাস্ত্র মানুষের সৃষ্টি। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মনে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করে। ষোল বছর বয়সেই তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে মেনে নেননি। তিনি সকল ধর্মের সমালোচনা করলেও সকল ধর্মকেই নিজের ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন (ঘোষ, ১৯৮৮ : ভূমিকা)।

৩

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দের সহযোগিতার। সেজন্য, ব্রিটিশরা সীমিতভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে। বাংলায় নব্য শিক্ষিত সমাজের সূচনা এভাবেই হয়েছিল। স্মর্তব্য, ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) প্রত্যক্ষ চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের পাঠক্রমে ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ইত্যাদি তালিকাভুক্ত ছিল। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পাঠপীঠ ছিল এই হিন্দু কলেজ। ইয়ং বেঙ্গল দলের গুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিভাবান, বিচক্ষণ ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য, পড়ানোর কৌশল ও ছাত্রদের বোঝানোর ক্ষমতা ছিল ঈর্ষণীয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্রসহ বহু মেধাবী ছাত্র ডিরোজিও-র অনুসারী হয়ে ওঠেন। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল (মনজুর, ১৯৯০ : ১২৩-২৭)। উল্লেখযোগ্য, কুসংস্কারমুক্ত উদার চেতনাবোধ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করে মানবধর্মে উজ্জীবিতদের মধ্যে মরমী কবি লালন শাহ্ (১৭৭৪-১৮৯০), দেধরাজ (১৭৭১-১৮৫২), পল্টুসাহব (১৭৫৭-

১৮২৫), করম শা প্রমুখ ছাড়াও, সমকালীন কয়েকটি দল যেমন, কর্তাভজা, বলবাসী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, ন্যাড়া, সহজী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সংযোগী, যদুপাতিয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

রামমোহন ধর্মীয় কুসংস্কারের বিষয়টি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়" (ঠাকুর, ২০০৪ : ৮৪৫)। রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, "রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল" (ঠাকুর, ২০০৪ : ৮৪৫)। রামমোহন বহু বিবাহ নিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির বিষয়ে রামমোহনের ভাবনা ও উদ্যোগ অবিস্মরণীয়। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র বৈঠকে নারীদের নানা সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। সহমরণ বিষয়ে রামমোহন যেসব বই রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও তিনি নারীশিক্ষার কথা উপস্থাপন করেছেন (ঘোষ, ১৯৮৪:২১২)। রামমোহনের পথ ধরেই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাধাকান্ত দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাচীন সমাজ, ধর্মীয় কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার বাহক হন।

৪

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষণীয়। সম্ভবত, সে কারণেই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, পর্তুগীজ পাদ্রি মানোএল দ্য আসসুম্পসাউঁ। তাঁর রচিত ব্যাকরণের নাম : Vocabulario Idioma Bengalla e Portugues dividido em duas Partes অর্থাৎ, "বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ দুই ভাগে বিভক্ত"। এর প্রথমভাগে বাংলা ভাষার বৈয়াকরণ সূত্র ও শেষভাগে বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ স্থান পেয়েছে। আসসুম্পসাউঁয়ের ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ ভাওয়ালের আঞ্চলিক প্রাত্যহিক ভাষাকেন্দ্রিক। ব্যাকরণটি রচিত হয় ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন থেকে রোমান লিপিতে প্রকাশিত হয়। আসসুম্পসাউঁ পর্তুগীজ লিপিতে ব্যাকরণটি রচনা না করে, লাতিন লিপিতে রচনা করেছিলেন। এর অন্যতম কারণ, তিনি লাতিনকে সমস্ত ভাষার জননী ও লাতিন বর্ণমালাকেই সমস্ত ভাষার লিখন-প্রণালীর মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন (দাশ, ১৪০৭ : ২৬)। আসসুম্পসাউঁ ভাওয়ালের আঞ্চলিক ভাষার ওপর নির্ভর করে ব্যাকরণ রচনা করলেও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ক্রমশ আঞ্চলিক ও প্রাত্যহিক ভাষা পরিহার করে সংস্কৃত থেকে ঋণ করতে থাকেন বিপুল থেকে বিপুলতর শব্দ, যার একটি বড় অংশ হয়তো কখনো কেউ ব্যবহার করেননি (আজাদ, ১৯৮৫ : ৩)।

সেকালে বাংলা ভাষার মর্যাদার তুলনায় সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার প্রভাব ছিল ঈর্ষণীয়। বিদেশি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে বাংলা শিখেছিলেন। ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যে তখন সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি, ইংরেজিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রণয়নে পণ্ডিতগণ মনোনিবেশ করেছিলেন। বিদেশি পণ্ডিতদের সংস্কৃতানুরাগ বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হয়েছিল। এই পর্বে যাঁরা ইংরেজদের জন্য বাংলা-ইংরেজি অভিধান ও বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন, তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের বংশধর বলে মনে করেছেন এবং সেভাবেই অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেছেন (দাশ, ১৪০৭ : ৪৪)।

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণবিদের নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)। হ্যালহেড ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। হ্যালহেড বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছিলেন। বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁর মনে এমন একটি চিন্তা গড়ে উঠেছিল, যা তৎকালীন অন্য কোনো পণ্ডিতের মনে উদ্রেক হয়নি। তাঁর মতে, বাংলাদেশের শাসনকার্যে ফারসি অচল, হিন্দুস্থানী অসম্পূর্ণ এবং বাংলা অপরিহার্য (দাশ, ১৪০৭ : ৪৭)। কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা ভাষা-চর্চা একান্ত অপরিহার্য মনে করেই তিনি ব্যাকরণ প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন।

বাংলা ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে হ্যালহেড অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তবে, বাঙালির অজ্ঞতা ও শৈথিল্যের ফলে, বিশেষত কোনো দেশীয় ব্যাকরণিক আদর্শের অভাবের কারণে সমসাময়িককালে বাংলা ভাষার অবনতি হয়েছিল। এই অবনতি তিনি গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন (দাশ, ১৪০৭ : ৬৩)। হ্যালহেডের কৃতিত্ব হলো, তিনিই সর্বপ্রথম দেশের শাসন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা তথা, বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচনার পর কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা ব্যাকরণ অপরিহার্য পাঠরূপে পরিগণিত হয় এবং সে ধারা শুধু ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রয়াসে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি পরম্পরাগত সাধারণ ঐতিহ্যের সূত্রে গ্রথিত হয় (দাশ, ১৪০৭ : ৬৭)।

হ্যালহেডের ব্যাকরণ অতি অল্পকালের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায়, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। কেরীর ব্যাকরণটি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কেরীর ব্যাকরণটি সংস্কৃত-ঘেঁষা। কেরী সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের প্রায় সমস্ত কথ্য ভাষারই জননী বলে মনে করতেন। কেরীর ব্যাকরণ মূলত বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত এবং তা বিদেশীদের বাংলা ভাষাচর্চার পথ সুগম করেছিল।

কেরীর পর বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন জি. সি. হটন (১৭৮৮-১৮৯৪)। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে হটনের ব্যাকরণটি প্রকাশিত হয়। হটনের ব্যাকরণে হ্যালহেড ও কেরীর

ব্যাকরণের ছাপ লক্ষণীয়। হ্যালহেড এবং কেরীর ব্যাকরণে বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির বিষয়াদি লক্ষ করা গেলেও হটনের ব্যাকরণে কোনো মৌলিকত্ব পাওয়া যায় না। হটন ছাত্রদের প্রয়োজনের বিষয়টি মাথায় নিয়েই ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে উইলিয়াম ইয়েট্স (১৭৯২-১৮৪৫) কেরীর যথার্থ উত্তরসূরি (দাশ : ১৪০৭ : ১৩২)। ইয়েট্সের বাংলা ব্যাকরণ ও পাঠসংগ্রহ দুই খণ্ডে রচিত। ইয়েট্স প্রথম খণ্ডে ব্যাকরণ সমাপ্ত করে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সহকর্মী পাদ্রি জে. ওয়েঙ্গারের কাছে রেখে স্বদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় দুই বছর পর ওয়েঙ্গার দ্বিতীয় খণ্ডের অসম্পন্ন অংশ রচনা করে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি মানরূপ দাঁড় করানোর জন্য বিদেশিদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক। সে-প্রচেষ্টা মূলত সংস্কৃত-নির্ভর সাধু ভাষা-কেন্দ্রিক। ইয়েট্সই সম্ভবত, সর্বশেষ বিদেশি ব্যাকরণবিদ যিনি বাংলা ভাষার সংস্কৃতঘনিষ্ঠ রূপটি অন্বেষণ করেছেন। তাঁর পরবর্তী বিদেশি বৈয়াকরণগণ সংস্কৃত বলয়ের বাইরে বাংলা ভাষার নিজস্ব মিশ্র প্রকৃতি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আগ্রহ পোষণ করেছেন (দাশ, ১৪০৭ : ১৩৫)।

বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। সুনীতিকুমারের মতে, রামমোহনই প্রথম বাঙালি যিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলার জন্য ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহন রচিত ব্যাকরণটির নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। রামমোহন বিলেত থাকা অবস্থায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকরণটি প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনার পূর্বে রামমোহন ইংরেজদের জন্য 'Bengalee Grammar in the English Language' শিরোনামায় ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহনের নিজের মুদ্রাযন্ত্র Unitarian Press থেকে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকরণটি প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' মূলত 'Bengalee Grammar in the English Language'-এর অনুবাদ। ইউরোপীয়দের রচিত ব্যাকরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে রামমোহন বাংলার স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ স্পষ্ট করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। রামমোহন নিজস্ব ভাষা-যুক্তি দিয়ে বাংলা ভাষার বিশেষত্বকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনার অনেক বিষয় অনাবশ্যক মনে করে বর্জন করেছিলেন। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ রামমোহন কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক প্রভৃতি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেছেন (ঘোষ, ১৯৮৮ : ৪২৬-২৭)।

রামমোহন বাংলা উপাদানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ যেমন – বিশেষ্য, বিশেষণ, কারক ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় কোথাও সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বজনবিদিত সংজ্ঞা ও পরিভাষা গ্রহণ করেছেন, কোথাও আবার বাংলা ভাষার প্রকৃতির প্রয়োজনে নতুন সংজ্ঞা ও পরিভাষা রচনা করেছেন। রামমোহন বাংলা বর্ণমালার বিবরণ,

উচ্চারণ ও লিপি বিষয়ে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী স্বর ১৬ + ব্যঞ্জন ৩৪টি নির্দেশ করলেও ণ, য়, ব, ষ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, অং, অঃ বর্ণগুলি যে সংস্কৃতমূল শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

রামমোহনের মতে, সন্ধিপ্রক্রিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়বস্তু এবং বাংলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সেজন্য তিনি সন্ধি-প্রকরণ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠককে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে Case অর্থে 'কারক' শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট এবং ক্রিয়ার সঙ্গে নাম পদের অন্বয়ই কারকের লক্ষণ বিবেচনা করে। রামমোহন 'Case' কথাটিকে বিদেশি অর্থে গ্রহণ করে, বিদেশি প্রয়োগ-তাৎপর্য অনুযায়ী এর নতুন নাম দিয়েছেন, 'পরিণমন'।

লিঙ্গ আলোচনায় তিনি মানুষ ও ইতর প্রাণীভেদে কতকগুলি বাংলা প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন। শব্দের স্বরান্ত-হলন্ত রূপভেদে এসব প্রত্যয়ের ব্যবহারও পৃথক। এসব প্রত্যয় ছাড়াও পুং বাচক শব্দের পূর্বে 'স্ত্রী' শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন – চীল – স্ত্রী চীল, শশারু – স্ত্রী শশারু। জাতি বা সম্প্রদায় অর্থে সম্বন্ধবোধক বিভক্তির সঙ্গে স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহার লিঙ্গ প্রকরণে রামমোহনের 'বাঙালি'ত্বের অনন্য নিদর্শন; যেমন – বারেন্দ্রের কন্যা, নাগরের স্ত্রী, ইংরেজের বিবি ইত্যাদি। বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় ছাড়াও কতকগুলি তদ্ভব তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। দেশবাচক এবং স্বভাববাচক শব্দগঠনে আই, ইয়া, ঈ, ইয়ে<ইয়া, ও<উয়া, মি, আমি প্রভৃতি খাঁটি বাংলা প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন।

সমাস পর্যায়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। রামমোহন সংস্কৃতের শ্রেণিবিভাগ বা সমাস-নাম গ্রহণ করেননি, তিনি সমাসের শ্রেণিবিভাগে সমস্যমান পদের অর্থ ছাড়াও 'সমস্ত' পদের রূপের ওপরও দৃষ্টি দিয়েছেন। সমাসকে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন। এছাড়া, Interjection পর্যায়ে খাঁটি বাংলা শব্দগুলির প্রয়োগ, বাংলা ভাষার প্রতি রামমোহনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় বহন করে (দাশ, পৃ. ১৩৭-১৪৩)। রামমোহনের ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য হলো, ভাষার বিশিষ্টতাগুলিকে নিয়মবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করে রাখা। ভাষার উচ্চারণ ও গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে সেগুলিই নিজস্ব রীতিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। যান্ত্রিকভাবে তিনি কয়েকটি সূত্র ও সংজ্ঞা নির্দেশ না করে তা ব্যাখ্যা ও আলোচনার দ্বারা পাঠকের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছেন। বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ বাংলা ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই তিনি আলোচনা করেছেন (ঘোষ, ১৯৮৪ : ১১-১২)।

৫

রামমোহন মানবধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নয়নে রামমোহনের অবদান অগ্রগণ্য। ইংরেজি ভাষা ও

সংস্কৃত ভাষার রাজত্বকালে রামমোহন বাংলা ভাষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রাচীনকালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেননা হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯২ : ৮৬)।

রামমোহন বাংলা গদ্য রচনার পথিকৃৎ এবং তিনি অন্য ভাষার গদ্যরীতি অনুসরণ না করে বাংলার নিজস্ব গতি- প্রকৃতি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচনা পড়তে হলে পাঠককে কী উপায়ে তার অন্বয় করতে হবে, তার হিসেব তিনি বলে দিয়েছেন। রামমোহনের গদ্য যে আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে, তার প্রধান কারণ হলো, তাঁর বিচার-পদ্ধতি ও তর্কের রীতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতশাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। সে পদ্ধতিতে আমরা গদ্য না লিখে, ইংরেজি গদ্যের সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্য গতিই অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। রামমোহন রায়ের গদ্যে বাগাড়ম্বর নেই। সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃতবহুলও নয় (চৌধুরী, ১৯৮৫ : ৩৮২)। উল্লেখযোগ্য, রামমোহনের পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীগণ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রচনারীতির দিক দিয়ে উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর গদ্য রামমোহনের গদ্য অপেক্ষা বেশি সুবোধ্য ও শক্তিশালী। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব হলো, তিনি বাংলা ভাষায় বেদবেদান্ত চর্চার পথ প্রবর্তন করেন এবং বিচার-বিতর্কের ভাষারূপে বাংলা গদ্যভাষাকে সুগঠিত করে তোলেন (ঘোষ, ১৯৮৮ : ভূমিকা)। রামমোহনের গদ্যে প্রাচীনত্ব ও পণ্ডিতিরীতির ছাপ লক্ষণীয়। তিনি বাংলা গদ্যের প্রবহমান ছন্দ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা গদ্য যে শুধু পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নয়, সমাজ ও বিতর্কেরও ভাষা – এ সত্যটিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৬

একটি ভাষার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণ হুবহু অনুকরণ না করে বাংলা ব্যাকরণের নিজস্ব বিষয়টি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন-পরবর্তী বাঙালি পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় ব্যাকরণের আদলে বাংলা ব্যাকরণ রচনা না করে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

বাংলা গদ্য রচনা ও বাংলা ভাষার জন্য ব্যাকরণ-রচনা প্রমাণ করে রামমোহন বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রামমোহনের গদ্য, সাহিত্য

হিসেবে ততটা প্রভাব ফেলতে না পারলেও, গদ্য যে শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনায় সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মনোভাব প্রকাশেরও মাধ্যম তা তিনি দেখিয়েছিলেন। রামমোহন মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার জন্য কাজ করেছেন। সে জন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কট্টর ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা রামমোহনকে নানাভাবে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তবে, রামমোহন নিজ কর্মে অটল থেকেছেন। মেধা, মনন, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ তাঁকে অনন্য করেছে। সর্বোপরি, বাংলা ভাষা উন্নয়নে রামমোহন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা. ১৯৮৮)। *রামমোহন-রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

অমলেন্দু দে (১৯৯১)। *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

আনিসুজ্জামান (২০০১)। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্যাপিরাস, ঢাকা

প্রমথ চৌধুরী (১৯৮৫)। 'মাতৃভাষা বনাম চলিত ভাষা', *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ (প্র. সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৯২)। *বঙ্কিম-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৮৪)। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪)। *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা

নির্মল দাশ (১৪০৭)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

নূরুল ইসলাম মনজুর (১৯৯০)। *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলা সমাজ*, সমতট প্রকাশনী, ঢাকা